পরিবেশ সংরক্ষণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ইউনিট ১০

ভূমিকা

পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্ক নিবিড়, আবিচ্ছেদ্য এবং অপরিমেয়। মানুষের কল্যাণ কেবল মানুষের উপরই নির্ভর করে না। মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং প্রকৃতির দান এই প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে মানুষ বেঁচে থাকে, জীবনীশক্তি পায় ও সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের বিপর্যয় বা দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ জীবনযাত্রাকে কখনও কখনও বিপর্যস্ত ও দুর্বিসহ করে তোলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করা মানুষের পক্ষে এখনও অসাধ্য। তাই আমাদের উচিৎ দুর্যোগের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা এবং এর মোকাবেলা, প্রস্তুতি, সতর্কতা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান নিয়ে এর ঝুঁকি ও ক্ষতি যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা। সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে, পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হলে এই বিপর্যয় রোধ করা প্রয়োজন। আর এজন্য দরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা অর্জন ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ : পরিবেশ সংরক্ষণ
পাঠ - ১০.২ : পরিবেশ দূষণের কারণ
পাঠ - ১০.৩ : পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ
পাঠ - ১০.৪ : পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা
পাঠ - ১০.৫ : দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
পাঠ - ১০.৬ : দুর্যোগের ধরন
পাঠ - ১০.৭ : দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি
পাঠ - ১০.৮ : দুর্যোগকালীন সতর্কতা ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পাঠ-১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ কী বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিবেশ সংরক্ষণ কীভাবে করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

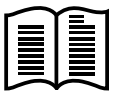

পরিবেশ (Environment)

মানুষ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবী পরিমন্ডলের বাস করে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষের পরিবেশ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে আমাদের চারাপাশের আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, গাছপালা এবং পশুপাখিকে বোঝায়। পরিবেশের এই উপাদানগুলোই মানুষকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেষ্টিত রাখে।

পরিবেশ সংরক্ষণ (Conservation of Environment)

পৃথিবীতে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপন করতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা দরকার। পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে বোঝায় মানুষ, অন্যান্য প্রাণি ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের নিশ্চয়তা। পৃথিবীতে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ এবং এর গুণমান বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

পরিবেশ সংরক্ষণ মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে।

ক) ভৌত সংরক্ষণ, যেমন-ভূ-গর্ভস্থ পানি, খনিজ, রূপা, সোনা, তামা, সীসা, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস সুরক্ষিত করা ও গুণমান বজায় রাখা।

খ) জীব সংক্রান্ত সংরক্ষণ, যেমন-বিভিন্ন জীব বা জীব প্রজাতি।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য

পরিবেশ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার সুরক্ষা এবং পরিচালনা। পরিবেশ সংরক্ষণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় এবং যাবতীয় ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রিত থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবেশ সংরক্ষণে জনগণকে সচেতন করার জন্য একটি স্লোগান লিখুন

সারাংশ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপন করতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা দরকার। পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে বোঝায়-মানুষ, অন্যান্য প্রাণি ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের নিশ্চয়তা। সংরক্ষণ মূলত দুই ধরনের-ভৌত ও জীব সংক্রান্ত। পরিবেশ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো-প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার, সুরক্ষা এবং পরিচালনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবেশ সংরক্ষণ মূলত কত ধরনের?

ক) ১ ধরনের খ) ২ ধরনের

গ) ৩ ধরনের ঘ) ৪ ধরনের

২। পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হলো-

i) প্রকৃতি ও প্রাকৃতির সম্পদের সুরক্ষা

ii) প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ

iii) প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ পরিবেশ দূষণের কারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ দূষণ কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিবেশ দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

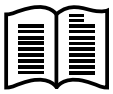

পরিবেশ দূষণ

প্রাকৃতিক কারণে অথবা মানুষের কার্যকলাপে সৃষ্ট উদ্ভূত দূষিত পদার্থ যখন পরিবেশকে বিষময় করে তোলে তখনই আমরা দূষণ শব্দটা ব্যবহার করি। পরিবেশের প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান, যেমন-মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব পরিবর্তন ঘটলে তা জীবজগতের উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। এটিকে পরিবেশ দূষণ বলে। ক্ষতিকর পদার্থের বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যহত হয়, তখনই পরিবেশ দূষিত হয়। প্রতি বছরই পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন হচ্ছে। এই সম্মেলনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতন করা। মানুষের মধ্যে এই বোধ সৃষ্টি করা যে, আমাদের বেঁচে থাকার পৃথিবী একটাই। কাজেই পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এ উদ্যোগে শরিক হতে হবে। ধরিত্রী তার মানুষ দিয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যেমন- অসংগতিপূর্ণ নগরায়ন, জমির অতিকর্ষণ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, জমিতে অতি মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ইত্যাদি সবকিছু মিলে পরিবেশকে দূষিত করছে এবং সামগ্রিক পরিবেশগত ভারসাম্য ব্যহত হচ্ছে। যেসব কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটে তা বিষদভাবে বর্ণনা করা হলো।

পরিবেশ দূষণের কারণ

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ও পরিবেশ দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করছে। বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজনে বনজঙ্গল, গাছপালা কেটে চাষের জমি তৈরি করা হয় বা বসতবাড়ি নির্মাণ করা হয়। গাছপালা কাটার ফলে বৃষ্টিপাত কমে যায়, খরার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অধিক জনসংখ্যা পরিবেশের ওপর অধিক চাপ সৃষ্টি করে, স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে কলুষিত করে এবং পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন, শিল্পকারখানা সবকিছুর চাহিদাই বৃদ্ধি পায়। অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে অধিক কীটনাশক ও সার ব্যবহার, ভূগর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে মৃত্তিকা দূষণ হচ্ছে। অধিক শিল্পকারখানা, যানবাহন, পানি ও বায়ুদূষণ ঘটাচ্ছে।

২। **নগরায়ন :** নগরায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকারখানা ও গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বায়ু দূষণের সৃষ্টি করছে। বাস, ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ির হর্ণ থেকে শব্দ দূষণ হচ্ছে। আবার নদীর পানিতে কলকারখানার আবর্জনা মিশে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। এছাড়া নিম্ন অঞ্চলে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে মশার বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। নগরায়ণের ফলে মানুষ কাজের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বসবাস করছে। শহরে অধিক জনসংখ্যার ফলে আবাসন সমস্যা দেখা দিচ্ছে, বস্তি গড়ে উঠছে। বস্তিতে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সমস্যা ও ময়লা-আবর্জনা ফেলার অব্যবস্থা ও সচেতনতার অভাব পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

৩। **জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট সমস্যা :** সমগ্র বিশ্বে আজ জলবায়ুর পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হিমালয়ের বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এভাবে যদি চলতে থাকে তবে আগামী ৩০ বছরে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অনেক দেশ সমুদ্রের তলে বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের দেশেরও অধিকাংশ ভূমি সমুদ্রতলে হারিয়ে যাবে। বিপন্ন হবে জীবন ও সম্পদ। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা, নদীর প্রবাহ হ্রাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস পানযোগ্য পানির অভাব, মৎস্যসম্পদ ধ্বংস, ফসল উৎপাদন হ্রাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি ভয়াবহ দুর্যোগে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

৪। **বনজ সম্পদ ধ্বংস :** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ৮%। বন সম্পদ ধ্বংসের অন্যতম কারণ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, জ্বালানি সংগ্রহ ও কৃষিজমি সম্প্রসারণ। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জ্বালানি, বাড়িঘর, আসবাবপত্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যাপকহারে বনজ সম্পদ উজাড় হচ্ছে। ফলে ভূমিক্ষয় হয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

৫। **অপরিকল্পিত শিল্পায়ন :** বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন। খাদ্যসামগ্রী তৈরির কারখানার পাশে সার ও কীটনাশক তৈরি কারখানা, বর্জ্য নিষ্কাশনে অব্যবস্থাপনা এবং পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাশয়ে গিয়ে বর্জ্য পতিত হচ্ছে। ফলে পানি ও বায়ু দূষণ ঘটছে। ওজোন স্তর হ্রাস পাচ্ছে, গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬। **অপরিকল্পিত বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন** ঃ শিল্পকারখানা, আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সেগুলো মাটিতে শোষিত হচ্ছে বা পার্শ্ববর্তী জলাধারে গিয়ে পড়ছে, ফলে মাটি ও পানি দূষিত হচ্ছে।

৭। **নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট :** নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হওয়ার ফলে বৃষ্টির পানি সরে যেতে পারে না, জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

৮। **ইটভাটা :** কোনো নিয়মনীতি ছাড়া এদেশে অসংখ্য ইটভাটা গড়ে উঠেছে, যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। ইটভাটায় কাঠ ব্যবহারের ফলে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে এবং ইট পোড়ানোর ফলে বায়ুতে নির্গত বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯। **অচল ও অধিক যানবাহন ব্যবহার :** অচল ও অধিক যানবাহন ব্যবহারের ফলে অধিক জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ সৃষ্টি হচ্ছে।

১০। **অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার :** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে গিয়ে কৃষি কাজে অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে, ফলে মাটি ও বায়ুদূষণ ঘটছে।

১১। **ভূমি ক্ষয় :** নগরায়ন, পাহাড় কাটা, জলাশয় থেকে নুড়ি-বালু, পাথর উত্তোলন, বনজ সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি কারণে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবেশ দূষণের কারণগুলো উল্লেখ করে একটি পাঠ তৈরি করুন।

সারাংশ

পরিবেশ দূষণ বলতে বোঝায় কোনো ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যহত হওয়া। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন-মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদিতে যখন ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক পবির্তন ঘটে এবং তা যখন জীবজগতের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় পরিবেশ দূষণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। এতে মানুষ, অন্যান্য প্রাণি ও উদ্ভিদ জগতের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। শিল্পায়ন, নগরায়ন, বৃক্ষ নিধনসহ নানা কারণে পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ কোনটি?
ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি খ) বনজ সম্পদ ধ্বংস
গ) অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ঘ) ইট ভাটা

২। অধিক যানবাহন চলাচলের কারণে-
i) মাটি দূষণ ও বায়ুদূষণ ঘটে
ii) বায়ু দূষণ ও শব্দদূষণ ঘটে
iii) শব্দ দূষণ ও পানি দূষণ ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও iii

পাঠ-১০.৩ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ দূষণ হতে রক্ষা পাওয়ার উপায়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সূত্র ধরে বলা যায়- বিশ্বের পরিবেশকে বাস উপযোগী রাখার পরিকল্পনা দিতে পারে বিজ্ঞানই, তাই বিজ্ঞানের বক্তব্যকে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন হলে বিশ্বের সকল মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে দেশে পরিবেশ দূষণের কারণ, উৎপত্তিস্থল চিহ্নিতকরণ, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রেখে দূষণ প্রতিরোধ কর্মসূচিকে জরুরী ভিত্তিতে যত তাড়াতাড়ি কার্যকর করা যাবে দেশের জন্য তা ততই মঙ্গলজনক হবে। নিচে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায়সমূহ উল্লেখ করা হলো।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায়

১। দেশের আপামর জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণের কারণ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ করার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে, যেমন- রেডিও-টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সেমিনারের মাধ্যমে জোরদার প্রচার চালানো।

২। শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে 'পরিবেশ দূষণ'কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৩। দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে অর্থাৎ ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে 'পরিবেশ দূষণ' নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করে সামাজিক সংগঠনসমূহ যাতে প্রতি মাসে অন্তত একটি সেমিনার আয়োজন করে তার জন্য আইন পাস করা।

৪। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রাক্কালে যথাযথ জরিপ ও উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুপারিশ গ্রহণের বিধান বাধ্যতামূলক করা।

৫। গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকার জন্য সরেজমিন প্রতিবেদন প্রদানের ব্যবস্থা করে এদের কার্যকলাপের মূল্যায়ন সাপেক্ষে উৎসাহজনক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

৬। সম্ভাব্য দুর্ভোগ ও পরিবেশ দূষণের হাত হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার সর্বোত্তম হাতিয়ার হচ্ছে দেশের সর্বত্র প্রচুর গাছপালা লাগানো ও বনভূমির নির্বিচার নিধন রোধে আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। বৃক্ষ নিধন কার্যকলাপ রোধ করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে ও বন্যপ্রাণি দেশ থেকে বিতাড়িত হলে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়বে। অথচ বনাঞ্চল কেবল পরিবেশ রক্ষার প্রধান হাতিয়ারই নয় বরং বনাঞ্চল ভূমি দূষণ রোধ করে এবং পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে। বনভূমি প্রকৃতির এক অমোঘ ভারসাম্য বিধান। তাই এ বিধান এর উপর হস্তক্ষেপ মানে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করা।

৭। আমাদের দেশের জনবসিতপূর্ণ শহরাঞ্চলের আবাসিক এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মত ফ্যাক্টরি গজিয়ে উঠছে। নগরীর আবাসিক এলাকার বাইরে শিল্প কারখানা স্থাপন করা গেলে এই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান পাওয়া যাবে। সর্বোপরি বস্তি এলাকার অধিবাসীদেরকে স্বাস্থ্যসম্মততভাবে পুনর্বাসন করতে হবে, তা' না হলে শহর ও নগরসমূহ দূষণমুক্ত হবে না।

৮। বায়ূদুষণ হতে পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে দূষিত পদার্থ নির্গত হওয়ার সময় এতে এমন পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দিতে হবে যাতে এরা বায়ুকে দূষিত করার পূর্বেই নিরপেক্ষ (neutral) হয়ে যায়। পরিমিত দূষিত পদার্থের জন্য রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমন্ডলে ছিটিয়ে দিয়ে দূষিত পদার্থকে নিরপেক্ষ করা যায়। জাপান এসিড বৃষ্টি প্রতিরোধকল্পে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সফলতা লাভ করেছে।

৯। অনেক দেশে ইতোমধ্যেই মটরযানের ধোঁয়াঘটিত দূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সীসামুক্ত পেট্রোল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। মটরযানে নির্গত ধোঁয়া ও বিকট শব্দের জন্য নিরোধক যন্ত্র লাগিয়ে নিলে দূষণ সৃষ্টিকারক উপাদান হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। এভাবে হাইড্রলিক হর্ণের পরিবর্তে শব্দ দূষণরোধে মিউজিক হর্ণ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

১০। পানিকে দূষণের হাত হতে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সচেতনতাবোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেও ক্রমশঃ পানি দূষণ রোধ করা যায়। ফসল ক্ষেতে কীটনাশক ও আগাছানাশক ঔষধের ব্যবহার কমিয়ে জৈবিক (Biological) পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কেননা উক্ত ঔষধের প্রয়োগে আমাদের মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে ও এসবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষক্রিয়া আমাদের জনশক্তিকেও দুর্বল করে দিচ্ছে।

১১। দেশের নগরসমূহের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, পৌর আবর্জনা ও জঞ্জাল স্থানান্তর এবং পরিষ্কারের জন্য আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, শহর এলাকার নালা-নর্দমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি কড়াকড়ি আরোপ ও নজরদারীর জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যায়।

স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ হল গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যথাযথ সচেতনা সৃষ্টি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার ও জনগণের মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম সফল হওয়া সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায়সমূহ একটি পোস্টার প্রদর্শন করুন।

সারাংশ

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে একক উদ্যোগ নয় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগেরও প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণের কারণে নানাধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, যেমন-বায়ু, পানি, মাটি এবং শব্দ, নানা ধরনের ক্ষতিকর উপাদান দিয়ে দূষিত হয়ে থাকে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, যেন আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত না হয়। গাছপালা প্রকৃতির অংশ এবং মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষ অনবদ্য ভূমিকা রাখে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের একযোগে কাজ করার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। বর্তমানে পরিবেশ দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এটি প্রতিরোধ করতে হলে সকলের সচেতন থাকা আবশ্যক। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণেই এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। একক উদ্যোগ নয় বরং সম্মিলিত উদ্যোগই পারে পরিবেশ দূষণকে প্রতিরোধ করতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বেশি প্রয়োজন কোনটি?

ক) দলগত প্রচেষ্টার চেয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

খ) মোটামোটি চেষ্টা

গ) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে দলগত প্রচেষ্টা

ঘ) চিন্তা করা

পাঠ-১০.৪ পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষায় পরিবারের করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিবেশ আমাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রতি পরিবার যদি পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হয় তবে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। মানুষের অস্তিত্ব, পৃথিবীর জীবনধারণ, পরিবেশের সম্পূর্ণতার উপর নির্ভর করে। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের জন্য পরিবেশের পুষ্টিসাধনপূর্ণ পরিচালন অপরিহার্য।

পরিবার ও পরিবেশ সংরক্ষণ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে গড়ে উঠেছে পরিবেশ। এজন্য জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদেরকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে। পরিবেশ নীতির দিকগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে।

সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা

পরিবেশের সাথে রয়েছে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। তাই পরিবেশকে আমরা সংরক্ষণ করব, যত্ন নেব। বাড়ি, কলেজে ও আশেপাশে বেশি গাছ লাগাবো ও গাছের যত্ন নেব। আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখব। পরিবেশ দূষণকারী সব কাজ থেকে বিরত থাকব। পরিবেশ উন্নয়নমূলক সকল কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করব। তাহলেই বিশ্ব পরিণত হবে 'সুন্দর আবাসভূমি'তে। গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ দূষণ রোধ বা সংরক্ষণকল্পে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবার তার নিজেদের প্রয়োজনে যেমন পরিবেশ দূষিত করছে আবার তাদেরই প্রয়োজনে পরিবশে দূষণ মুক্ত রাখার দায়িত্ব পরিবারেরই। পরিবেশ দূষণ ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিবার সচেতেন হলে সে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে চেষ্টা করবে। পরিবার যদি নিজেরা সচেতন না হয়ে পরিবেশকে এভাবে দূষিত করে, তবে তার খেসারত তো পরিবারকেই বহন করতে হয়। পরিবারে ছোট বড় সব সদস্যকে সচেতন করে তুলতে হবে যে, কীভাবে তারা পরিবেশ দূষণ করছে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে তাদের কী পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা শুধু নিছক কথা নয়, এটাকে কাজে পরিণত করতে হবে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার মানসিকতা ও অনুভূতি যদি না থাকে, তবে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে অনেক ধারণা থাকলেও সেটা কাজে আসবে না।

দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষায় পরিবারের করণীয় সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা নিচে দেয়া হলো:

১. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবারের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে দলগত প্রচেষ্টা বেশি প্রয়োজন। পরিবারের প্রতিদিনের বর্জ্য বা ময়লা যেন পরিবেশ দূষণ না করে, এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

২. পরিবেশ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। যেমন-গৃহে ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। পানি না ফুটিয়ে পান করলে তা স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পানি ফুটিয়ে পান করা উচিত। এছাড়া পরিবারের সকলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

৩. যেসব আবর্জনা বিনষ্ট হয় না তা কম ব্যবহার করা। যেমন-সেলোফিন বা প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য কম ব্যবহার করা। মশা, মাছি, ইঁদুর, তেলাপোকা নিধনে ডি.ডি.টি পাউডার, কয়েল, মরটিন, এ্যারোসোল ইত্যাদির ব্যবহার কমাতে হবে।

৪. নিজের চাওয়াকে ত্যাগ করে সমাজের কল্যাণকে গুরুত্ব দেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। পরিবারের কেউ ধূমপান করলে ধূমপানের কুঅভ্যাস পরিহার করতে হবে।

৫. ঘর বাড়িতে ভাঙ্গা কলকব্জার ব্যবহার করা যাবে না।

৬. পরিবারের সবাইকে টেলিভিশন ও সিডি প্লেয়ার জোরে না বাজিয়ে আস্তে শুনতে হবে।
৭. গৃহস্থালি তৈজসপত্র সাবধানে ব্যবহারে করা যাতে শব্দ নিয়ন্ত্রিত থাকে।
৮. বাড়ির আশেপাশের পরিবেশ যেন ঠিক থাকে সেজন্য ছোট বড় গাছপালা রোপণ করতে হবে।
৯. পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তুলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিকল্পিত পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
১০. সর্বোপরি দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষার সুষ্ঠুনীতি ও আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন।
১১. পরিবারে গাড়ি থাকলে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে যেন গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত না হয়। পরিবেশ দূষণ রোধে গোটা বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায়

১. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা
২. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ
৩. ক্ষতিকর সিনথেটিক বর্জন
৪. নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার
৫. উন্নয়ন ও দূষণমুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার
৬. বেশি বেশি গাছ লাগানো।
৭. টেলিভিশন ও ক্যাসেট প্লেয়ার জোরে না বাজানো

নাগরিক হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে পাশাপাশি এলাকার পরিবেশ সুন্দর রাখাও আমাদের দায়িত্ব। পরিবেশ রক্ষায় সরকারীভাবে ২০০২ সালে পলিথিনের ব্যবহার, অতিথি পাখি ধরা ও শিকার করা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাহাড় কাটা ও জলাভূমি ভরাট রহিত করা পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি আইন মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। এসব কর্মকান্ডে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ করাও পরিবারের সদস্যদের একান্ত কর্তব্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবেশ দূষণরোধে পরিবারের করণীয় কার্যক্রমের চার্ট তৈরি করুন।

সারাংশ

পরিবেশ আমাদের জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আর পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিটি পরিবার যদি পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হয় তবে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবেশ সংরক্ষণে পবিারের ভূমিকা কোনটি?
ক) বনাঞ্চল রক্ষা করা খ) পাহাড় কাটা বন্ধ করা
গ) জলাশয় ভরাট প্রতিরোধ করা ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণের সকল আইন মেনে চলা

২। পরিবেশ দূষিত হয় কীভাবে?
i) যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও জোরালো শব্দে
ii) অসংহতিপূর্ণ নগরায়নের ফলে
iii) পশু-পাখির মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৫ দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্যোগ বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবণতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও ধাপ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহিত সরকারি কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবণতা

বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ঝড়, ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়মিত ঘটনা। ভৌগলিকভাবেই পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ বাংলাদেশের এসব দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছর মানব সম্পদসহ অবকাঠামোগত, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধন করে। ভৌগলিক অবস্থানগত বাস্তবতাই এর প্রধান কারণ। নদীবিধৌত বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কিছু পার্বত্য অঞ্চল ও বিস্তীর্ণ সমতলভূমি জুড়ে রয়েছে সাত শতাধিক নদী। তাই হিমালয়ের বরফগলা পানিতে যেমন বন্যা সৃষ্টি হয় তেমনি হিমবাহ হতে হয় অতিবৃষ্টি। আমাদের দেশের অবস্থান উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে এবং দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস (২৭° সে.)।) ফলে সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এসব ঘূর্ণিঝড় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর উৎস ভারত ও নেপাল। পার্শ্ববর্তী দেশের নদী শাসনের কারণে এদেশে বন্যা ও খরার মত দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া অতিবর্ষণে বন্যা ও নদীভাঙ্গন প্রায় নিয়মিত ঘটনা। অর্থাৎ ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু, ভূমির গঠন, নদীমাতৃক ভূমিরূপ, সমুদ্রের অবস্থান ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট ঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগের সাথে বসবাস করেই আমাদের জীবনধারণ করতে হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট আকস্মিক ও চরম প্রতিকূল পরিবেশগত অবস্থাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোনো দেশেই মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যহত, বিপর্যস্ত ও দুর্বিসহ করে তোলে। বিশ্বের সর্বত্রই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কম-বেশি আঘাত হানে। প্রাকৃতিক তান্ডবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে করণীয় প্রায় কিছুই থাকে না। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যাতে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়। আমাদের দেশের মানুষ বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বেশি অভ্যস্ত। যেমন ঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে এদেশের মানুষ চিরায়তভাবেই সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে, শৃংখলার সাথে দুর্যোগ মোকাবেলা করা স্বাভাবিকভাবেই অধিক কার্যকরী হয়। যেমন- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্র থাকায় সমুদ্র সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বারবার দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে। এতে মানবসম্পদসহ বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এসব ক্ষতি হ্রাস করতে ও বিপর্যয় কাটাতে প্রয়োজন সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য

ক) দুর্যোগকালীন মানবজীবন, গবাদি ও বন্য প্রাণি এবং পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করা।
খ) ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের কাছে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানো।
গ) দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনায় রেখেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

আগেই বলা হয়েছে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হল একটি সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে তিনটি স্তরের বা ধাপের একটি সমন্বিত ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে। যথা:

১। দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি
২। দুর্যোগকালীন সতর্কতা
৩। দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার

অর্থাৎ দুর্যোগের ভয়াবহতা মোকাবেলায় ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী স্তরে গৃহিত পদক্ষেপ ও কার্যক্রমকেই এক কথায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপাদানসমূহ কী কী উপায়ে কাজ করে তা নিচে একটি চক্রের সাহায্য দেখানো হল-

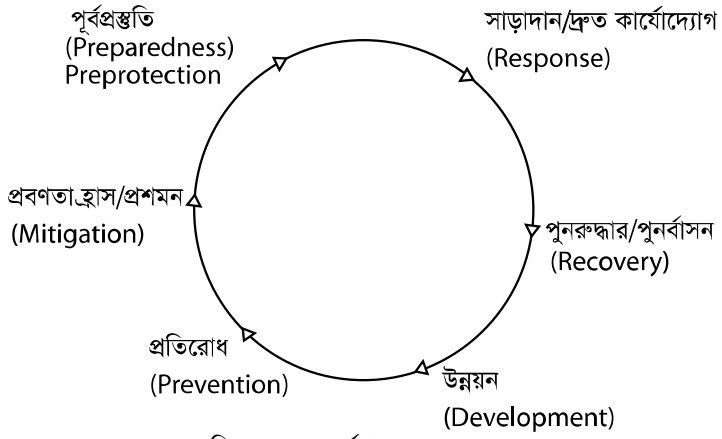

চিত্র ১০.১ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার সাথে সাথে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। আসুন, এবার আমরা এসব কমিটিগুলোর কয়েকটির নামের সাথে পরিচিত হই।

জাতীয় পর্যায়ের কমিটি

১। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
২। আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি
৩। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি
৪। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড
৫। দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল
৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণ সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি
৮। দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি

স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি

১। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২। থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ কোন ধরনের দুর্যোগের সম্মুখীন হয়? এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

সারাংশ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল। এদেশের নদী বিধৌত ও উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রায় নিয়মিত ঘটনা। আকস্মিকভাবে সৃষ্টি এ চরম প্রতিকূল পরিবেশগত অবস্থায় একটি সমন্বিত ও সুষ্ঠু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, দুর্যোগের ভয়াবহতা মোকাবেলা করে দুর্যোগঘটিত কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তিনটি পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সতর্কতা ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?
ক) দুর্যোগ প্রতিহত করা
খ) দুর্যোগের সময় জীবন রক্ষা করা
গ) একটি সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা
ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা।

২। বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণতার কারণ-
i) ভৌগোলিক অবস্থান
ii) নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি
iii) উপকূলীয় অঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

পাঠ-১০.৬ দুর্যোগের ধরন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত পরিবর্তনসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এর প্রকৃতি

জল, স্থল আকাশ সবখানেই দুর্যোগ হানা দিতে পারে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, মরুকরণ ইত্যাদি দুর্যোগ একাধারে যেমন প্রকৃতির উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তেমিন ভূমিরূপ পরিবর্তনসহ প্রকৃতির নানাবিধ স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আসুন, আমরা একে একে এসব দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করি।

১। **ঘূর্ণিঝড় :** উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বায়বীয় ঝড়কে ঘূর্ণিঝড় বলে। এটি উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে বিষুবরেখার দুই প্রান্তের শান্ত সমুদ্রে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সমুদ্রে লঘুচাপের সৃষ্টি করে। পরে তা নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়। ঘূর্ণিঝড় মারাত্মক ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

চিত্র ১০.৬.১ : ঘূর্ণিঝড়

চিত্র ১০.৬.২ : জলোচ্ছ্বাস

২। **জলোচ্ছ্বাস :** নিম্নচাপের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় যখন প্রবল বেগে স্থলভাগের দিকে ধেয়ে আসে। তখন বাতাসের বেগে সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে এবং ঝড়ের সাথে সাথে স্থলভাগের উপর আঘাত হানে। এছাড়া সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলেও জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। একে সুনামি বলে। সুনামির তীব্রতা ভয়াবহ হতে পারে এবং পানির উচ্চতা ১২ ফুট পর্যন্ত উঠতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জলোচ্ছ্বাস হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ১০.৬.৩ : সুনামি

চিত্র ১০.৬.৪ : ভূমিকম্প

৩। **ভূমিকম্প :** ভূপৃষ্ঠের যে গতিশীল অবস্থায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক ধ্বংস করতে সক্ষম তাকে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্পের তীব্রতা বা মাত্রা রিখটার স্কেলে পরিমাপ করা হয়। এর সর্বোচ্চ মাত্রা ৯। তবে ৬/৭ মাত্রার ভূমিকম্পেও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়। ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলই এর ঝুঁকিতে আছে। অপরিকল্পিত ও ঘনবসতিপূর্ণ নগরী ঢাকাতে একটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেই অসংখ্য প্রাণহানির আশংকা রয়েছে।

৪। **বন্যা :** বাংলাদেশের বন্যার স্বাভাবিক সময় বর্ষাকাল। অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল, নদী গর্ভে পলি জমা, নদীর গতি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে যখন নদীর পানি স্বাভাবিক সীমার উপরে অর্থাৎ বিপদসীমার উপরে উঠে আসে তখন নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা নদীর পানিতে প্লাবিত হয়। একেই বন্যা বলে। বন্যার ফলে বিস্তীর্ণ স্থলভাগ প্লাবিত হয়ে পানির নিচে চলে যায়। ফলে, জনমানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করতে পারে। এছাড়া ফসল, গবাদি পশু, অবকাঠামো ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

চিত্র ১০.৬.৫ : বন্যা

চিত্র ১০.৬.৬ : নদীভাঙ্গন

৫। **নদীভাঙ্গন :** নদীভাঙ্গনের ফলে নদীর তীরবর্তী এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কোনো কারণে নদীর চলমান গতিপথ বাধাগ্রস্থ হলে নদীর পানির প্রবাহ তার গতিপথ পরিবর্তন করে প্রবাহিত হয়। এতে স্রোতের তোড়ে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ভাঙ্গন শুরু হয়। নদী ভাঙ্গনে বহু মানুষ স্থাবর সম্পদ হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে পড়ে।

৬। **খরা :** দীর্ঘদিন পানির অভাবে ভূমির অবস্থাকে খরা বলে। খরায় জলাভূমি শুকিয়ে যায় এবং মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কোনো অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অস্বাভাবিক রকম কম হয়ে খরা সৃষ্টি হয়। এতে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চিত্র ১০.৬.৭ : খরা

চিত্র ১০.৬.৮ : মরুকরণ

৭। **মরুকরণ :** কোনো অঞ্চল মুরুভূমিতে পরিণত হওয়াকে মরুকরণ বলে। বিভিন্ন কারণে কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভের পানির স্তর কমে যাওয়া, বন উজাড় ইত্যাদি।

৮। **বজ্রপাত :** কালবৈশাখীর মৌসুমে মার্চ থেকে সে মাসে এবং অক্টবর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সাধারণত ঝড় ও বৃষ্টির সাথে বজ্রপাত হয়ে থাকে। একে বজ্রঝড়ও বলে। বায়ুমন্ডলে যখন খাড়াভাবে সৃষ্টি হওয়া বিশাল আকৃতির

পরিচলন মেঘ তৈরি হয় তখনই বজ্রঝড় অর্থাৎ বজ্রপাত হয়ে থাকে। বজ্রপাতে বাংলাদেশের প্রতিবছর গড়ে দুই থেকে তিনশ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আশংকার কথা হলো প্রতিবছর বজ্রপাতে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দুর্যোগ মাত্রই জীবজগতের সবার জন্য নিদারুন কষ্টের ও দুর্ভোগের। তাই, দুর্যোগ সম্পর্কে জানা ও এর প্রভাব যতটা সম্ভব লাঘব করার বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো কী কী হতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমি, বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, মরুকরণ, বজ্রপাত ইত্যাদি দুর্যোগ জনমানুষের জীবনের বহুবিধ ক্ষতি সাধন করে। এসব দুর্যোগের ধরন, তীব্রতার প্রকৃতি ভিন্নতর। দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগ ও পরিবেশগত পরিবর্তনও একেক রকম হয়ে থাকে। দুর্যোগের বিভিন্ন প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন দুর্যোগটির সাথে নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের কোন সম্পর্ক নেই?

ক) ঘূর্ণিঝড় খ) বন্যা

গ) ভূমিকম্প ঘ) নদীভাঙ্গন

২। জলোচ্ছ্বাসের উৎপত্তি হয়-

i) সমুদ্রপৃষ্ঠে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে

ii) নদীভাঙ্গনের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে

iii) সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্পের প্রভাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-১০.৭ দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- দুর্যোগের ক্ষতি সীমিত রাখতে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

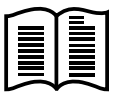

দুর্যোগপুর্ব প্রস্তুতি

দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্বকালে গৃহিত কার্যক্রমকে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলে। অর্থাৎ দুর্যোগপূর্ব সময়ে গৃহিত ব্যবস্থাপনা যা দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে তাকেই দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলা যায়। এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন- দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা, আপদকালীন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সম্পদ সংগ্রহ করা, জনগণকে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য যানবাহন, কর্মী ও প্রচার মাধ্যম প্রস্তুতিকরণ ইত্যাদি দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

দুর্যোগ যে কোনো জাতি, গোষ্ঠি, সমাজ, অঞ্চলের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। তাই এ আকস্মিক বিপর্যয় ও চরম পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি থাকা আবশ্যক। কেবল পূর্বপ্রস্তুতি থাকলেই দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব।

দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতিতে করণীয়

দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক মূল বিষয় হলো সময়মতো পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। দুর্যোগপূর্ব সময়ে জনগণকে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। এদের মধ্যে অত্যন্ত জরুরী কিছু করণীয় হল-

১। দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহে শুকনা খাবার, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, পানি, ঔষধ, মোম, দেয়াশলাই ইত্যাদি আপদকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগনের কাছে দ্রুত নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা।
২। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কে জানা।
৩। দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ সঠিক ব্যাখ্যাসহ গুরুত্ব সহকারে দ্রুততার সাথে প্রচার নিশ্চিত করা।
৪। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যেমন- রেডিও, টিভি, মাইক ব্যবহার করে সরকারি, বেসরকারি, জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত দুর্যোগের পূর্বাভাস দ্রুততার সাথে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করা।
৫। দুর্যোগের আগেই বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্গত জনগণকে আসতে উদ্বুদ্ধ করা।
৬। দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ও পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করা।
৭। দুর্যোগ টেকসই স্থাপনা, যেমন- ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, পুল, বাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।
৮। দুর্যোগপূর্ব প্রচার ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত বাহিনী গড়ে তোলা।
৯। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে এবং মাটি, পানি, বায়ু দূষণ বন্ধ করতে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইন লংঘনকারীর শাস্তি বাস্তবায়ন করা।
১০। পরিবেশের উন্নতিকল্পে বৃক্ষ রোপণ, বনায়ন, নদী শোধন, জলাশয় উদ্ধার ও সংরক্ষণ ইত্যাদি নীতি গ্রহণ করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	কক্সবাজার জেলায় দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতিতে কোন্ কোন্ বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব সময়ে গৃহিত কার্যক্রমকে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলে। দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি থাকলে দুর্যোগের ভয়াবহতা বহুলাংশে কমানো সম্ভব। এতে যেমন জীবন ও সম্পদের রক্ষা হয় তেমনি দেশের অর্থনীতির উপর চাপ কম পড়ে। তাই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতিসমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য কী?

ক) দুর্যোগ প্রতিহত করা
খ) দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস করা
গ) দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি পূরণ করা
ঘ) দুর্যোগের পরে দ্রুত পুনর্বাসন করা

২। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি বলতে বোঝায়-

i) আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দুর্যোগের পূর্বাভাস জানা
ii) দুর্যোগের সময় দুর্গত জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিশ্চিত করা
iii) দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে শুকনা খাবার, পানি, ঔষধ ইত্যাদি মজুত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) iii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-১০.৮ দুর্যোগকালীন সতর্কতা ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্যোগকালীন সহর্কতাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

দুর্যোগকালীন সতর্কতা

দুর্যোগ চলাকালীন গৃহিত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম যা দুর্যোগ হতে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে এবং ক্ষতি হ্রাস করতে সহায়ক হয় সেটাই দুর্যোগকালীন সতর্কতা। দুর্যোগকালীন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আসুন আমরা কয়েকটি দুর্যোগকালীন সতর্কতা সম্পর্কে আলোচনা করি।

১। দুর্যোগ চলাকালে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে বা যেকোনো নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে হবে।
২। দুর্যোগকালীন জনগণকে আবেগ তাড়িত না হয়ে বিবেচনার সাথে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে।
৩। দুর্যোগকালীন দুর্গত জনগণকে সম্ভব হলে কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন শুকনা খাবার, পানি, দেয়াশলাই, মোমবাতি ইত্যাদি সাথে রাখতে হবে।
৪। বন্যার সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী পলিথিন বা পানিরোধক প্যাকেটে মুড়ে ঘরের চালের নিচে নিরাপদে উঁচু স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা।
৫। ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত পেয়ে পানির কলসি বা পাত্র এবং শুকনা খাবার প্লাস্টিক ব্যাগে করে মাটির নিচে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করা।
৬। ভূমিকম্পে মাথা ঠান্ডা রেখে তাড়াহুড়ো না করে কাঠের টেবিল বা খাটের নিচে মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে থাকা এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে বাইরে বের হয়ে আসা ইত্যাদি।
৭। বজ্রপাতের সময় যখা সম্ভব পাকা ঘর ও বাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিতে হবে। উঁচু গাছ, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও বৈদ্যুতিক তারের নিচে বা কাছে থাকা যাবে না। খোলা জায়গায়, ফসলের মাঠে থাকলে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়তে হবে।

দুর্যোগকালীন সতর্কতা নি:সন্দেহে দুর্যোগের ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। তাই আমাদের উচিৎ দুর্যোগে অস্থির ও হতাশ না হয়ে বরং দুর্যোগকে বুদ্ধির সাথে মোকাবেলা করা।

দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা মূলত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির উপর নির্ভর করে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি যেমনই হোক না কেন দুর্গত মানুষকে উদ্ধার, ত্রাণ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান, ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো মেরামত ও পুন:নির্মাণ ও বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা প্রদান করে মানব সম্পদসহ স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ রক্ষা করাই দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে যত দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে দুর্গত জনগোষ্টি তত দ্রুত স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারবে। এতে দেশের অর্থনীতির উপর দুর্যোগের প্রভাব কম হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। আমাদের রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক। এ বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটি ও সামরিক বাহিনী অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে দেশের জনগণকে দুর্যোগ হতে রক্ষা করার কাজ করে থাকে। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এখনও আমাদের আজানা। কিন্তু সঠিক ও সুষ্ঠু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে প্রকৃতির তান্ডবলীলা হ্রাস করতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। আপনার নিজের অঞ্চলে দুর্যোগকালীন সতর্কতা নিশ্চিত করতে আপনি স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? ২। দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার পুনর্বাসন ও পুন:নির্মাণ কার্যক্রমে করণীয় বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

দুর্যোগকালীন সময়ে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে গৃহীত সতর্কতাকে দুর্যোগকালীন সতর্কতা বলে। দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে খাবার পানি ও ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাসে সহায়তা করে। এছাড়া দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে তা দুর্যোগের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস হবে। যা নি:সন্দেহে দুর্গত জনগণ, দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূমিকম্পের সময় দুর্যোগকালীন সতর্কতায় করণীয় কোনটি?
ক) টেবিল বা খাটের নিচে মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে উপযুক্ত সময়ে বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করা
খ) দ্রুত উন্মুক্ত স্থানে বেরিয়ে আসা
গ) দড়ি বেয়ে নিচে নামার চেষ্টা করা
ঘ) যে যেখানে আছে সেখানেই অবস্থান করা

২। বন্যার সময় করণীয়-
i) প্রয়োজনীয় সামগ্রী পানিরোধক প্যাকেটে মুড়ে মাটির নিচে বা ঘরের চালের নিচে সংরক্ষণ করা
ii) গবাদি পশু ও শিশুদের নিরাপদে উচ্চ স্থানে অবস্থান করা
iii) শুকনা খাবার, পানির কলসে প্লাস্টিক ব্যাগে করে সংরক্ষণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার রাস্তার বেরোলেই কাঁকন ও কনক দুই ভাইবোনের মাথা ধরে যায়। এ অবস্থা হতে শহরগুলোকে বাঁচানো জরুরী। তারা ভাবে এক্ষেত্রে তাদেও কিছু দায়িত্ব রয়েছে।
ক) পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝেন?
খ) পরিবেশ সংরক্ষণে কাঁকন ও কনকের দায়িত্ব কী হতে পারে?
গ) পরিবেশ দূষণের কোন ক্ষতিকার প্রভাবের ইঙ্গিত উদ্দীপকটিতে দেয়া হয়েছে?
ঘ) আলোচ্য দূষণ হতে প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে মতামত দিন।

২। শিক্ষা সফরে সেন্টমার্টিন্স এ ঘুরতে এসে অপূর্ব ও দিব্য দুই বন্ধু ঘুরতে ঘুরতে এমন একটি দালান দেখতে পেল যার নিচতলাটা ফাঁকা। কেবল সারি সারি পিলার। উপরের তলাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা আর বড় বড় জানালা। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে আশ্রয় কেন্দ্র। এমন বাড়ি ওরা ঢাকায় আগে কখনও দেখেনি। ক্যাম্পে ফিরে এসে কৌতুহলবশে স্যারকে জিজ্ঞেস করাতে স্যার সব শিক্ষার্থীদের একসাথে ডেকে বুঝিয়ে বললেন।
ক) বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনস কোন ধরনের দুর্যোগের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?
খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি হ্রাসের জন্য কী প্রয়োজন?
গ) উপরের উদ্দীপকটি থেকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ঘ) সেন্টমার্টিনস এ সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা কী হতে পারে?
২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

৩। বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবণতার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কী?
৫। বন্যা ও নদীভাঙ্গনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৬। ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি কীভাবে হয়?
৭। বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট জনদুর্ভোগের একটি তালিকা করুন।
৮। দুর্যোগপূর্ব পরিস্থিতিতে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় কী?
৯। দুর্যোগকালীন সতর্কতাসমূহ বর্ণনা করুন।
১০। দুর্যোগ পরবর্তীকালে ক্ষতি মোকাবেলায় কী ব্যবস্থা নেয়া হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবেশ দূষণের কারণ আলোচনা করুন।
২। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
৩। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি ও পরিনাম বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১ : ১। খ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.২ : ১। ক, ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৩ : ১। গ,
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৪ : ১। ঘ, ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৫ : ১। গ, ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৬ : ১। গ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৭ : ১। খ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৮ : ১। ক, ২। ঘ